29-3-41

কালী ফিল্মসের

বাঙলার মেয়ে

সাধারণ গ্রন্থাগার

কাহিনী

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

পরিচালক

নরেশ মিত্র

সুরশিল্পী : অমর বসু (এঃ)

কালী ফিল্মসের নূতনতম চিত্রনিবেদন

বাঙলার মেয়ে

চরিত্র

উপেন বন্দ্যোঃ
তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী

—

জিতেন ব্যানার্জ্জী
নরেশ মিত্র

—

সত্যেন
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

—

মিঃ চ্যাটার্জ্জী
সন্তোষ সিংহ

—

সুবিনয়
অমর বসু (এঃ)

—

সুরেশ
কৃষ্ণধন মুখার্জ্জী

—

মিঃ চৌধুরী
ছবি বিশ্বাস

—

চাষী
তারক বাগ্‌চী

সরলা ... রাজলক্ষ্মী
মিসেস্ ব্যানার্জ্জী ... ইন্দিরা রায়
মিসেস দেবী ... পদ্মা দেবী
ইলা ... শীলা হালদার
বীথি ... সন্ধ্যারাণী
ভবানী ... উষা দেবী
শান্তি ... ছায়া (ছোট)
সুরেশের মা ... উষাবতী
শ্রীমতী মনোরমা,
মিসেস্‌রমা ব্যানার্জ্জী
এবং আরও অনেকে

সাধারণ গ্রন্থাগার বালি

আলোক-চিত্র-শিল্পী ঃ
সুরেশ দাশ
সহকারী ঃ
সুধীর বসু
সত্যেন চন্দ
সুনীল রায়
শব্দযন্ত্রী ঃ
সমর বসু
সহকারী ঃ
পরিতোষ বসু
সম্পাদনা ঃ
বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী ঃ
সন্তোষ ভৌমিক

বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপক ঃ
সুরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-ব্যবস্থাপক ঃ
বি, মজুমদার
সহকারী ঃ গোপী সেন
স্থির চিত্রশিল্পী ঃ
বিশ্বনাথ ধর
নৃত্যপরিকল্পনা ঃ
তারক বাগ্চী

কাহিনী

বৃদ্ধ বয়সে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গভীর একটি মনস্তাপ পেয়েছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জিতেন্দ্র তাঁর অমতে বিলাত গিয়ে ব্যারিষ্টারী পাশ করে' আসে এবং একটি আধুনিক কেতাদুরস্ত ঘরের অতিরিক্ত সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত বিলাসিনী মেয়ে শ্রীমতী মায়াকে পত্নী রূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। "বাধ্য হয়" কথাটির তাৎপর্য্য আর একটু পরিষ্কার করে' এখানে বলা প্রয়োজন।

জিতেনের ছিল প্রচণ্ড উচ্চাভিলাষ। উপেন্দ্র ছিলেন দরিদ্র নিষ্ঠাবান পুজারী ব্রাহ্মণ। জীবনে যতটুকু প্রয়োজন, তার বেশী আকাঙ্খা নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি। গ্রামের কুঁড়ে ঘর, শীর্ণা নদী, গাছ-পালা, পুকুর,—সরল অনভিজ্ঞ মানুষের প্রকৃতি ও সমাজের মাঝখানে কলরবহীন জীবন-যাপনের চেয়ে বেশী কিছু কাম্য তাঁর ছিল না। যশ আর ঐশ্বর্য্যের মোহ কোনদিন তাঁকে গ্রামের সরল জীবন, উদার নীলাকাশ, পল্লব-ছায়াঘন প্রান্তরের বাইরে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যেতে পারে নি। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা জিতেনের মনে প্রলোভন জাগিয়েছিল, আপনাকে বিপুল মহিমায় আচ্ছন্ন করবার, নেশা ধরিয়েছিল রূপের আর রূপার।

যে সময় জিতেনের তরুণ মনে এই স্বপ্নের ঘোর সৃষ্টি হয়েছিল সে সময় সুবিনয় অর্থাৎ জিতেনের শ্বশুর প্রচণ্ড নিষ্ঠার সঙ্গে সাহেবিয়ানায় মেতেছিলেন। একমাত্র কন্যা মায়ার সঙ্গে জিতেনের বিবাহ দিয়ে সুবিনয়, কন্যা-জামাতাকে বিলাত যাওয়ার রসদ জোগাতে কার্পণ্য করেন নি। সস্ত্রীক বিলাত গিয়ে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার দুর্দ্দম বাসনার সামনে এই সুযোগ অবহেলা করার কোন যুক্তি পিতার অসম্মতির বিরুদ্ধে টিঁকতে পারে না।

উপেন্দ্র ছিলেন একরোখা মানুষ। স্নেহের চেয়ে তাঁর কাছে সংস্কার ছিল বড়, আদর্শ ছিল অনেক ওপরে। সুতরাং জিতেন তাঁর অমত অগ্রাহ্য করে' সস্ত্রীক বিলাত গেল বটে কিন্তু ক্ষুব্ধ উপেন্দ্রনাথ পুত্র বলে' তাকে ক্ষমা করলেন না! জিতেনের নিকট হ'তে তাঁর কাছে পর পর তিনখানি পত্র এল। দুখানি পত্রের কোন উত্তর গেল না, এবং তৃতীয় পত্রের উত্তরে তিনি শুধু সংক্ষেপে জানালেন, "তুমি আমার ত্যাজ্য পুত্র। কখনো এ ভিটেয় তুমি এসো না—আমায় তোমার মুখ দেখিয়ো না।"

সেই হ'তে নিদারুণ অভিমানে জিতেন আর কোনদিন নিজের গ্রামে ফিরে যায় নি, ফিরে যেতে পায় নি পিতার স্নেহের আশ্রয়ে। তারপর কয়েকটি বৎসর অতীত হয়ে গেছে। যশ, অর্থ, সম্মান জিতেন সব কিছু অর্জ্জন করেছেন। তাঁর দুই কন্যা বীথি আর গীতি এবং আধুনিক ফ্যাসানের স্রোত-অনুবর্ত্তিনী স্ত্রী মায়াকে নিয়ে তাঁর জীবনের অনেকগুলি দিন কেটে গেল। আজ মাঝে মাঝে তাঁর কথাবার্ত্তায়, ভাবে ভঙ্গীতে যেন তাঁর মনে একটি পুঞ্জীভূত ক্ষোভ কোথায় সঞ্চিত হয়ে আছে বলে' মনে হয়। আধুনিক জীবনের বিকৃতি ও কৃত্রিমতা যেন তাঁকে বিষণ্ণ বিরক্ত ও পরিশ্রান্ত করে' তোলে। কিন্তু আজ আর কোন উপায় নেই; বহুদিন পূর্ব্বের ভুল দিনের পর দিন জীবনের চারিদিকে আরও সর্ব্বনাশের মোহ সৃষ্টি করেছে।

জিতেন্দ্র এই কাহিনীর নায়ক নয়—এই কাহিনীর নায়ক হ'ল তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা

সত্যেন্দ্র। তা সত্ত্বেও জিতেন সম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে এতখানি আলোচনা করবার প্রয়োজন ছিল এই যে, সত্যেন তার দাদারই জীবনের ভুল আর অশান্তিকে অনুসরণ করে', দেবীর মত একটি মেয়ের জীবন ব্যর্থ করে' দিয়েছিল। তাকে অবলম্বন করে' যে সংসার ধীরে ধীরে জিতেনের অভাব বিস্মৃত হতে চলেছিল, সেই সংসারকে ভেঙে দিয়ে সরে' আসবার নিষ্ঠুরতায় সত্যেনের অপরাধ হয়ে উঠেছিল গুরুতর। দাদা ছিল তার আদর্শ কিন্তু তার লোভ আর দুর্ব্বলতা তাকে দাদার চেয়ে গভীরতর মর্ম্ম-বেদনা স্বষ্টি করবার কলঙ্কে নিমজ্জিত করে' দিয়েছিল।

পূর্ব্বেই বলেছি উপেন্দ্রনাথের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। সুতরাং সত্যেন্দ্রকে এম-এ অবধি পড়াবার খরচ তিনি জোগাতে পারেন নি। কিন্তু সত্যেন্দ্র একদিন এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ল—শুধু পাশ করল না ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হয়ে পাশ করল। সত্যেনের উপর উপেন্দ্রনাথের অনেক ভরসা—তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের মত উচ্চাভিলাষের তাড়নায় কোন ধনবান শ্বশুরের কন্যাকে বিবাহ করে' বিলাত-যাত্রার সংস্থান অথবা সহরের সমারোহের মাঝখানে বসবাস করবার স্বচ্ছলতা সংগ্রহ করবার পথ রোধ করবার উপায়স্বরূপ তিনি সত্যেনের বিবাহ দিয়েছিলেন নিজের পছন্দমত একটি পাত্রীর সঙ্গে। মেয়েটির নাম দেবী। সরলা, অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে। কাজে কর্ম্মে অত্যন্ত পটু, লজ্জাশীলা। শ্বশুরের ভিটার উপর যারা চিরদিন প্রদীপ জেলে এসেছে, তুলসীতলায় সকাল সন্ধ্যায় প্রতিদিন যারা প্রণাম জানাতে ভোলেনি, স্বামীকে যারা অন্তরের একমাত্র দেবতা বলে' জানে, তাদেরই দলের একটি সহনশীলা কোমলমনা মেয়ে। মেয়েটির নাম দেবী—তার নাম তার চরিত্রকে পরিহাস করেনি, বরং তাকে গৌরবান্বিতা করেছে।

এই দেবী মেয়েটিই পরম আগ্রহে তার অঙ্গ থেকে অলঙ্কার খুলে দিয়েছে তার স্বামীর পড়বার খরচ জোগাতে। স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করে' বিদ্যা-চর্চ্চা করতে সত্যেন কুণ্ঠা বোধ করেছিল সত্য কিন্তু সাধারণের ওপরে নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করবার দুর্দ্দমনীয়তার কাছে আর কোন যুক্তি, কুণ্ঠা বা ঘটনাকে সে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। যেদিন তার এম, এ-তে ফাষ্ট হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হ'ল সেদিন উপেন্দ্রনাথ আনন্দিত হলেন। জিতেনও ছোট ভাইয়ের এই কৃতিত্বের সংবাদ পেয়ে টেলিগ্রাম করে' ভাইকে তাঁর কাছে আসবার জন্যে জানালেন। ছোট বোন ভবানী, বন্ধু প্রকাশ সকলেই আহ্লাদিত হ'ল। কিন্তু গভীর রাত্রে সংসারের সকল কাজ সেরে, ননদ ভবানীর কৌতুক ও পরিহাসের জোয়ার অতিক্রম করে' লজ্জা-জড়িত পদে নিরাভরণা যে মেয়েটি সত্যেনের সামনে এসে দাঁড়াল, তার দৃষ্টির উজ্জ্বলতায় যেন খুসী সবচেয়ে বেশী উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। এম, এ পাশ করার কৃতিত্ব যে কতখানি তা হয়তো অশিক্ষিতা সেই মেয়েটি বুঝত না, কিন্তু আজ তার দেবতা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার পেয়েছে, বহুজনের সম্বর্দ্ধনায় তার দেবতার গৌরব বৃদ্ধি দেবীর অন্তর নীরব তৃপ্তিতে কাণায় কাণায় ভরপুর করে তুলেছে। অলঙ্কারহীনা হওয়ার জন্যে তার মনে এতটুকু ক্ষোভ নেই, দেবতা যে তার উপচার গ্রহণ করেছেন এইজন্য সে আজ ধন্য। সে যখন তার নিজের নয়, সম্পূর্ণ রূপে তার দেবতার তখন অঙ্গের কয়েকটি অলঙ্কারও তো তার হ'তে পারে না।

গ্রাম্য একটি অশিক্ষিতা মেয়েকে স্ত্রীরূপে পাওয়ায় সত্যেন কোন দিন নিজেকে ভাগ্যবান বলে' মনে করেনি। আপ-টু-ডেট্-শিক্ষিতা একটি মেয়েকে প্রিয়া ও ঘরণী রূপে না পাওয়ার জন্যে সত্যেনের মনে যে ক্ষোভ ছিল, আজ এই নিরাভরণা নারীর

মহিমান্বিত আত্মসমর্পণের কাছে বোধ করি ক্ষণকালের জন্য তাকে লজ্জিত হতে দেখা গেল।

উপেন্দ্রনাথের ইচ্ছা সত্যেন নিজের গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরী গ্রহণ করে গ্রামেই বসবাস করে। দেবীরও আন্তরিক কামনা তাই। সত্যেন গাঁয়ে থাকলে সে তার কাছে থাকতে পায়; মনে মনে তার বড় ইচ্ছা, দিনান্তে একটিবার যেন তার স্বামীর মুখখানি দেখে।

গাঁয়ের স্কুলের শিক্ষকের মাইনে মাত্র চল্লিশ টাকা এবং তার উন্নতির শেষ ধাপ হ'ল পঁচাত্তর। চল্লিশ বা পঁচাত্তর টাকা উপার্জ্জন করে সত্যেন সন্তুষ্ট থাকতে চায় না। দাদার মত ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতি অর্জ্জন করবার অধিকার তার আছে। গ্রামের এই দারিদ্র্য-পীড়িত জীবন নিয়ে বংশপরম্পরায় বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই।

সত্যেন সহরে গেল দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সেখানে জিতেন তার সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি তুলে ধরলেন। জিতেন জানতেন না যে তাঁর ভাই বিবাহিত, জানতেন না যে তাঁর ভাই যে আজ এম, এ-তে ফাষ্ট হয়েছে তার জন্যে ভ্রাতৃবধুর কাছে তাঁর ভাই কতখানি ঋণী।

জিতেনের ব্যারিষ্টার-বন্ধু মিঃ চ্যাটার্জ্জী তাঁর কন্যা ইলার জন্যে একটি মনোমত পাত্রের সন্ধানে ছিলেন। সত্যেনের মত উচ্চাভিলাষী একটি মেধাবী যুবকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়তে বিলম্ব ঘটল না। সত্যেন দরিদ্র বটে কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জ্জীর অর্থের অভাব ছিল না। রূপসী ইলার প্রতি দুর্ণিবার আকর্ষণে, এবং বিলাত যাত্রার সুযোগের

প্রলোভনে পড়ে সত্যেন নিজের বিবাহের কথা দাদা বৌদি, তার ভাবী শ্বশুর ও ভাবী বধূর কাছে গোপন করে রাখল। তারপর বিবাহের ব্যবস্থা যখন প্রায় স্থির হয়ে গেল তখন বিবেক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কিন্তু তখন ফিরতে গেলে জিতেন এবং তার চেয়ে তার আধুনিক সভ্যতাভিমানী মেম্-সাহেবের ভদ্রতা সম্বন্ধ প্রশ্ন ওঠে, তাছাড়া এতখানি অগ্রসর হয়ে অকস্মাৎ নিজেকে সংশোধন করতে যাওয়ার মধ্যে যে আত্মসংযমের প্রয়োজন, তা বোধ করি সত্যেনের ছিল না। সত্যেন তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখল। দাদা আর বৌদিকে তার পূর্ব্ব বিবাহের কথা জানাল। কিন্তু বৃথা এই অন্তিম মূহুর্ত্তের মনের দ্বন্দ্ব।

সত্যেন সেই যে দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছে, এখনও ফিরল না। উপেন্দ্রনাথ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। পতিগতপ্রাণা দেবীর অন্তর কোন্ অজানা বিচ্ছেদ-বেদনার হাওয়ায় সকলের অলক্ষ্যে কেঁপে উঠল। অবশেষে গ্রামেরই একটি দরদী ছেলে, সত্যেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রকাশ সত্যেনের বিস্তারিত সংবাদ নিয়ে এল।

উপেন্দ্রনাথ কল্পনাও করতে পারেন নি যে জিতেনের মত সত্যেনও তাঁকে এমনি ভাবে ত্যাগ করে চলে যাবে—পিতা হয়ে পুত্রের ওপর কোন দাবীই থাকবে না! উপেন্দ্রনাথ আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন এই ভেবে যে আজ শুধু তাঁর দাবীরই অমর্য্যাদা ঘটল না—একটি স্বামীগতপ্রাণা নারীর অন্তরকে এমনি করে অপমানে ও আঘাতে, বেদনায় ও লজ্জায় জর্জ্জরিত করে তোলবার উপলক্ষ্য তিনিই। স্বামীপরিত্যক্তাকে এই হৃদয়হীনতা ও অবিচারের জন্য কি সান্ত্বনা তিনি দেবেন! উপেন্দ্রনাথ ব্যাকুল হয়ে

প্রকাশকে সঙ্গে নিয়ে সহরে এলেন সত্যেনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। জিতেন আর সত্যেন চোরের মত আত্মগোপন করে রইল। পিতার রূপ ধরে বিধাতা বুঝি এসেছিলেন এই ভ্রান্ত মানুষগুলিকে গভীর মনস্তাপের জীবনপথে ছুটে-চলা থেকে নিরত করতে, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত পিতা ফিরে গেলেন নিরাশ হয়ে; বিধাতা এমনি করে মানুষের জীবনে বিমুখ হয়ে ফিরে যায়।

সত্যেন আর ইলার বিবাহ প্রতিরোধ করা গেল না। বিবাহের পর সত্যেন বিলাত রওনা হয়ে গেল। কিন্তু শুধু ইলাকে জানানো হল না যে তার কোন সপত্নী আছে।

সময়ের স্রোত বয়ে যায়। দুঃখে দারিদ্র্যে দিন চলে, বেদনা অন্তরের গহনলোকে পরিব্যাপ্ত হয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করে। জীবনের দ্বন্দ্ব আর অভিশাপ দিনের পর দিন আরও উগ্রমূর্ত্তিতে দেখা দেয়।

জিতেনের সংসারেও একটি প্রচণ্ড অশান্তি বহুদিন ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। জিতেনের মেয়ে বীথিকে নিয়ে এই অশান্তি। বাপ-মায়ের অনাচার, বিলাসিতা এবং আধুনিকতার বিকৃতির বিরুদ্ধে সে যেন মূর্ত্তিমতী প্রতিবাদ। বাপ-মায়ের সংসারের শিক্ষা ও দীক্ষা থেকে সে ছিল দূরে। তার দাদামশায় এবং দিদিমা তাকে মানুষ করে তুলেছিলেন। তার দাদামশায় সুবিনয় একদিন যেমন ছিলেন পুরোদস্তুর সাহেব এখন তেমনি নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি হিঁদুয়ানী পালন করতে সুরু করেছেন। গীতা আর গঙ্গাজলের প্রতি এখন

তাঁর শ্রদ্ধা প্রগাঢ়। নিজেদ মেয়ে মায়ার উপর আধুনিক শিক্ষার কৃত্রিমতা যে সর্ব্বনাশা মোহ সৃষ্টি করেছিল, তারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি যেন নিতান্ত অনুতপ্তচিত্তে তাঁর নাত্‌নীকে প্রাচীন ধর্ম্ম সংস্কার আর আদর্শে অনুপ্রাণিতা করতে চেয়েছিলেন। বীথি তার কাকার এই হৃদয়হীনতা ও মিথ্যার আশ্রয়ে আত্মগোপন করে উচ্চাকাঙ্ক্ষা সার্থক করে তোলার সুযোগ গ্রহণ মনে মনে সমর্থন করতে পারেনি।

উপেন্দ্রের এক মাত্র কন্যা ভবানী এতদিন উপেন্দ্রের সংসারেই থাকত। ভবানীর স্বামী সুরেশ মানুষ হিসাবে নিতান্ত মন্দ ছিল না। কিন্তু ভাগ্য তাকে স্ত্রী প্রতিপালন করবার স্বচ্ছলতা থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। সুরেশের মা ছিল দুর্দ্ধর্ষা প্রকৃতির মুখরা মেয়ে মানুষ। শ্বশুর বাড়ীতে নানা নির্য্যাতন, প্রহার ও কলহের গ্লানির মাঝখানে ভবানী সংসার পাত্‌তে এল। কিন্তু সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা, দারিদ্র্য দুঃখ ও অপমান তাকে বেশী দিন সহ্য করতে হয়নি। তিন দিন অনাহারের পর ভগবান যেদিন তার আহার জোগালেন সেদিন আহারের গ্রাস মুখে তোলবার মূহুর্ত্তে অতর্কিত ভাবে মৃত্যু এসে সামনে দাঁড়াল।

সেই নির্ম্মম মূহুর্ত্তে ছ' ক্রোশ পথ অতিক্রম করে বৃদ্ধ উপেন্দ্রনাথ এলেন কন্যার সমাচার নিতে। তখন সব শেষ হয়ে গেছে। বেদনায় স্তব্ধ উপেন্দ্রনাথের হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে গেল তবু দু ফোঁটা চোখের জল তাঁর নয়নে দেখা দিল না।

এক একটি করে দুই পুত্র তাঁকে ত্যাগ করে গেছে, কন্যা ভবানী চরম লাঞ্ছনার জীবনে অপমৃত্যু বরণ করে নিতে বাধ্য হ'ল, পুত্রবধূ দুঃখ দুর্দ্দশার মাঝখানে নীরবে অশ্রু আর দীর্ঘশ্বাসের ব্যর্থ জীবন নিয়ে বৃথা প্রতীক্ষায় দিন দিন ম্লান শীর্ণ হয়ে চলেছে। উপেন্দ্রনাথ সকল দুঃখ শোক হিমালয়ের মত অটল অবিচলিত হয়ে সহ্য করেছেন। কিন্তু আর কত সহ্য হয়! মৃত্যুকে আজ আর তিনি দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন না।

দেবী আজ একা। তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার আজ কেউ নেই। হৃদয়ের ভাণ্ডার রিক্ত হয়ে গেছে। গ্রামের নির্জ্জন কুঁড়ে ঘরে চরম দারিদ্র্যকে বরণ করে স্বামীর ভিটায় সন্ধ্যা প্রদীপ জালবার জন্যে স্বামীপরিত্যক্তা পড়ে রইল। প্রতিদিন অল্প অল্প জর হয় কিন্তু কোথায় বা পথ্য, কে করবে চিকিৎসা। প্রতীক্ষার বিষণ্ণ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রচিত দিন ও রাত্রি। হায় অভাগিনী, অশিক্ষিতা গ্রাম্য বধূ, হায় বাঙলার মেয়ে তোমার প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষা যে ধন্য হয়ে গেল, তাই মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়ে সজল নয়নে বুঝি তোমার অন্তিম বাসনার মীমাংসার অপেক্ষা করছে।

ইতিমধ্যে সত্যেন বিলাত থেকে ফিরে এসেছে। আর বীথি প্রকাশের কাছ হতে সংবাদ পেয়ে এসেছে দেবীর রোগশয্যার পাশে। বীথির টেলিগ্রাম পেয়ে সত্যেন, ইলা, জিতেন আর মায়া এতদিন পরে গ্রামে এলেন।

রোগশয্যায় শুয়ে তাদের সাড়া পেয়ে দেবী ক্ষীণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কে!

বীথি জানাল, কাকা এসেছে।

আগ্রহে চঞ্চল হয়ে দেবী ব্যগ্র কণ্ঠে বলল, এসেছেন!

বীথি বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি রাগ, অভিমান কিছুই নেই, কাকীমা?

মৃত্যুপথ-যাত্রিণীর গভীর অন্তর হ'তে উচ্চারিত হ'ল, না—তিনি যে আমার স্বামী···

সঙ্গীতাংশ

বিথীর গান

কার অধরের হাসির রেখা
দিগন্তের ঐ ধারে
বুঝি এসেছ চলে চুপে চরণ ফেলে
ইসারায় কহে যেন সে কারে
সুন্দর হে সুন্দর হে
তব আবাহন
আকুল হইয়া আছে কতনা নয়ন
এখন কি লুকায়ে রয়ে
সকল চাওয়ার পারে
সকল মায়ার পারে
অন্তর ধন বুঝি না কেমন
তোমার কুহক পরশখানি
যাত্রা পথ পারে এনেছে টানি
কত আর ঘুরাবে মিছে
নিয়ে চল তোমার
সোণার রথের পিছে
হোক না সে যতই দূরে
বাঁধিও স্নেহেরি ডোরে।

(২)

ইলার গান

অজানা পথিক অচেনা পথিক
কে এল আমার দ্বারে
(সারা) নিশি ভরে শিয়রে গুঞ্জরিল জাগান সুরে,
চাঁদিনী ঘুমাতে চায়
শুকতারা বসে হায়
ধরেছি তোমার পায়
রাখিও মোরে ॥

না জানি স্বপন ঘোরে কিসের, তরে
চমকি উঠিনু আজ এমন করে
রহি রহি দোলে হিয়া
কে ডাকিছে পিয়া পিয়া
কি যেন ব্যাথায় বারে বারে
নিশি ভরে ॥

(৩)

সুরেশের গান

বাসনা ছিল যে মনে
মনের কথা জান্‌তো না কেউ
রেখেছিলাম সঙ্গোপনে।
নদীর ধারে একখানি ঘর
একটি কামিনী—
জোছ্‌না রাতে, বঁধুর সাথে
মধু যামিনী—
ঘুরে বেড়াই আপন হারা
যৌবনেরি ফুলবনে
কোনো আশাই মিট্‌লো না সই
রইল জমা মনের কোনে।

(৪)

ইলার গান

যুথিকা চামিলি বেলা
যুথিকা চামেলি বেলা
গোলাপ অপরাজিতা মল্লিকা সেফালিকা
কেতকি মেলা।
নেহারিকা স্বপন খেলা।
গোলাপ খুলিল রাঙামুখ
নিশারে মিনতি করে চুপ চুপ
হেনেছে পবন বঁধু দুখ—
ধরিব ছলা।
অভিমানিনী গেল চমকি—কি দেখি
আড়ালে সাধিয়া প্রিয় কেতকী
চলিল আবেসে চামেলি সকাশে
নিঠুর লীলা
চামেলি বেলা॥

(৫)

বিথীর গান

সব নাচত সবহুঁ গায়ত সব আনন্দে বাঁধিয়া
হৃদি কম্পিত ভূতলে লুঠত বেকত গৌরাঙ্গ কাঁতিয়া
হৃদি কম্পিত ভূতলে লুঠত পীত বসন ধূলি-ধূসরিত
ভূতলে লুটত গোরা চকিতে আপন হারা
মলিন ভেল মলিন ভেল
চন্দ্র আসন মলিন ভেল
অধরেতে হান মলিন ভেল
হেম অঙ্গ কজলে ভরিল
বেকত গৌরাঙ্গ কাঁতিয়া (নাচত)
বঁধুর মঙ্গল মৃদঙ্গ বাজত
এলত কত কত ভাতিয়া
গদ্ গদ্ মধুর হাসত।

(৬)

ইলার গান

আমার আঁখির বারি বহিয়া চলে তোমার পানে
বসে নিরালা সাজাই গলা ব্যাথার গানে।
আশা পথ ধরি কত যাব আর
পড়ে রহে খোলা কুটির দুয়ার
পাব কি তোমারে নিরজনে মোর
মরমের গোপন ধ্যানে॥
সেই সুদূরের নদী বাঁকে
উতল বাঁশি যদি ডাকে
আসিবে কি ছুটে দক্ষিণা
বারতা কহিতে কাণে।
কত দিন কত রাতি এল পাপিয়া কোকিল
কতই ফুকারী গেল কে জানে॥

শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্তৃক
এই প্রোগ্রাম-পুস্তিকাখানি
সম্পাদিত

●

দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী
এণ্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং
ওয়ার্কস্ লিমিটেড ১৮নং
বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে কর্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত - - -